জগদীশ গুপ্তের গল্পে দাম্পত্য : প্রয়োজন ও প্রবৃত্তি

প্রীতম চক্রবর্ত্তী

'রোমন্থন' গল্পের মুখবন্ধে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন—

> "শরৎচন্দ্র যখন বঙ্কিমহরা নিষ্প্রভ আকাশে শতচন্দ্র শোভায় উঠলেন বাঙ্গালীর মনপ্রাণ হরণ করে, তখন সে শশিতারা সে নভোমণ্ডল খচিত করে দেখা দিল জগদীশ তাঁহাদের অন্যতম। জগদীশ শরৎচন্দ্রের গোত্রজন, তাঁরই প্রতিভার মানসপুত্র। এই বস্তুতন্ত্র সংসারের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, কামনা-বাসনার পাঁকে মধুগন্ধ সুরভিতে অনুপম পদ্ম ফুটিয়ে তোলার শিল্পী এঁরা।"

জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যের বিশ্লেষণে জগদীশ গুপ্তকে আপাতভাবে শরৎচন্দ্রের গোত্রজন বলা গেলেও তাঁর 'মানসপুত্র' বলার ক্ষেত্রে সংশয়াতীত হওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের আদর্শবাদ জগদীশ গুপ্তে প্রায় অনুপস্থিত। আবার যে নগ্ন বাস্তব ও মনস্তত্ত্বের অন্ধকার স্তরকে জগদীশ গুপ্ত উন্মোচন করেছেন তা শরৎচন্দ্রের সমগোত্রীয় নয়। কল্লোলের সমকালে কলম ধরলেও সেই কালের কলোচ্ছ্বাসে নিজের লেখনীকে মিলিয়ে দেন নি। আর তাই তাঁর ছোটোগল্প হয়ে উঠেছে 'রূপে রসে অদ্বিতীয়'। কল্লোলের অন্যতম কাণ্ডারী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন—

> "বয়সে কিছু বড় কিন্তু বোধে সমান তপ্তোজ্জ্বল। তাঁরও যেটা দোষ সেটাও ওই তারুণ্যের দোষ— হয়ত বা প্রগাঢ় প্রৌঢ়তার।"

পুরাতনের প্রতি অবিশ্বাস ও প্রাচীনের মূলে কুঠারঘাত ছিল কল্লোলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই লক্ষণ জগদীশ গুপ্তের মধ্যেও ছিল। তবে যা ছিল না, তা হল 'যৌবনের দিশাহারা চঞ্চলতা'; তাঁর 'স্থিতধী প্রৌঢ়তা'ই কল্লোলের লেখকদের থেকে দূরত্ব নির্মাণ করেছিল। যৌবনের উচ্ছ্বাস, সম্ভোগ উল্লাস, রোমান্টিক জীবনদৃষ্টি বা দারিদ্র্যের আস্ফালনের বদলে তির্যক দৃষ্টি, বিজ্ঞান মনস্কতা, নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণই জগদীশ গুপ্তের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সংশয় অবিশ্বাস ও বিজ্ঞানবুদ্ধিকে আশ্রয় করেই জগদীশ গুপ্ত বাংলা কথাসাহিত্যে নিয়ে আসেন আধুনিকতা। মানবজীবনের অন্তর্লোকে গভীরভাবে আলোকপাত করেন। এই ধারাতেই পরবর্তীকালে এসেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ প্রমুখেরা।

আধুনিক কথাশিল্পী হিসাবে মানবিক সম্পর্কের মাঝে কোনো ভাবালুতাকে প্রশ্রয়

দেননি। নির্মোহ দৃষ্টিতে কেবল পর্যবেক্ষণ ও উপস্থাপন করেছেন। বিশ্লেষণের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন পাঠকের হাতেই। ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্যের তাৎক্ষণিক ও তথাকথিত বোধের বাইরে দাঁড়িয়েই তিনি গভীর জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজছেন। সময়ের বৈনাশিকতা ধরা আছে তাঁর গল্প উপন্যাসের ব্যক্তি চরিত্রের বিনষ্টির মূলে। রবীন্দ্রসমকালে সাহিত্য রচনা করলেও 'অন্ধকারের মাঝে' কোন আলোর দিশা দেখাননি। মানবজীবনের হতাশা, ব্যর্থতা, অপ্রাপ্তি ও বঞ্চনার আড়ালে তিনি দাঁড় করিয়েছেন নির্মম এক শক্তিকে; মেঘনাদের মতই অলক্ষ্যে থেকে সে মানুষকে নিয়ে চলেছে অন্ধকর থেকে আরও গভীর অন্ধকারে। এই কারণেই তিনি হয়ত তথাকথিত জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হয়ে উঠতে পারেন নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও জগদীশ গুপ্তের প্রথম উপন্যাস *লঘু-গুরু* (১৯৩১)-কে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর কঠোর বাস্তববাদ, নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করলেও সেখানে কিন্তু 'লালসার অসংযম' বা 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' নিয়ে প্রশ্ন তোলেন নি। *পরিচয়* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

> "এই উপাখ্যানে বিষয়টি সামাজিক কলুষঘটিত বটে, তবুও কলুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার উৎসাহ এর মধ্যে নেই।"

আসলে জগদীশ গুপ্তের শিল্পীমনের অন্তঃস্থলে ছিল আত্মআবিষ্কারের প্রকৃত প্রচেষ্টা। সেই অবিচল সততা হয়ত রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল। তাই তাঁর প্রথম গল্প সংকলন *বিনোদিনী* (১৩৩৪) প্রকাশের পরই রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে জগদীশ গুপ্তকে প্রশংসাসহ লেখেন—

> "ছোটগল্পের বিশেষ রূপ ও রস তোমার লেখায় পরিস্ফুট দেখিয়া সুখী হইলাম।"

রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের বিপুল প্রভাবের মাঝখানে দাঁড়িয়েও জগদীশ গুপ্তের গল্পে দাম্পত্যের যে চিত্র মেলে তা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার প্রথম যুগেই রচিত *চিত্রাঙ্গদায়* লিখেছিলেন—

> "... যদি পার্শ্বে রাখ
> মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
> যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
> কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
> যদি সুখে দুঃখে কর সহচরী,
> আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা-য় এই সংরূপের বিবর্তন ঘটলেও মূল ভাবনার কোন পরিবর্তন হয়নি। তাই তাঁর শেষ পর্বের ছোটগল্প 'ল্যাবরেটরি' গল্পের নায়ক নন্দকিশোরের মুখেও এই একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

> "স্বামী হবে এঞ্জিনিয়ার আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটুনি, এটা মানবধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা জাতে গাঁটছাড়া বাধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।"

তবে দাম্পত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা এখানেই শেষ নয়। *'সবুজ পত্র'* ছাড়াও পূর্বের একাধিক গল্প, 'নষ্টনীড়', 'মধ্যবর্তিনী' প্রভৃতি গল্পে এবং *চোখের বালি, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, দুই বোন* প্রভৃতি উপন্যাসে দাম্পত্যের বিবিধ স্তর উন্মোচন করেছেন। কিন্তু মূল সুর বাঁধা আছে চেতনাগত সাম্যের ধারণাতেই। যার অবস্থান বঙ্কিমি পাতিব্রত্যের বহু দূরে। শরৎচন্দ্রের বেশ কিছু গল্প উপন্যাসে এই বঙ্কিমি সতীত্বের আদর্শ ছায়া ফেললেও তাঁর প্রধান কিছু উপন্যাস দম্পত্য বিষয়ে গভীর প্রশ্ন উপস্থাপন করে। *চরিত্রহীন*-এর কিরণময়ী তার তীব্র জীবন পিপাসা নিয়ে দাম্পত্যে একনিষ্ঠ থাকতে পারে নি। আবার *গৃহদাহ*-এর অচলা স্বামী মহিম ও স্বামীর বন্ধু সুরেশের মধ্যে সদা সচল থেকেও শেষ পর্যন্ত 'মহিমের হাত ছাড়িল না'। *শেষ প্রশ্ন*-এর কমল বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা নিয়ে বহু মন্তব্যের পর শেষে প্রশ্ন তোলে—

"সতীদাহের বাইরের চেহারাটা রাজশাসনে বদলালো, কিন্তু তার ভেতরের দাহ আজও তেমনি জ্বলছে? তেমনি করেই ছাই করে আনছে? এ নিভবে কি দিয়ে?"

তার মনে হয়েছিল— সংসারে বিবিধ ঘটনার মাঝখানে বিবাহও একটা কিন্তু এই ঘটনা যখন থেকে মেয়েদের জীবনের সর্বস্ব হয়ে উঠেছে তখন থেকেই তাদের জীবনে নেমে এসেছে 'ট্র্যাজিডি'।

এই ট্র্যাজেডির স্বরূপ সন্ধান করেছেন জগদীশ গুপ্তও, তবে তা তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। ভাবালুতাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে আলোকপাত করেছেন সম্পর্কের গভীরে। জগদীশ গুপ্তের বড় আয়তনের ছোটোগল্প 'বিধবা রতিমঞ্জরী'। নায়িকা তথা গল্পের প্রধান চরিত্র রতিমঞ্জরীর ট্র্যাজেডির মূল এই দাম্পত্যের শিকড়েই প্রোথিত ছিল। দাম্পত্যের গুরুত্ব রতি-মঞ্জরীর কাছেও ছিল, কিন্তু সে তো বেঁচে থাকার তাগিদেই। স্বামীর মৃত্যুর পর কোন আদর্শবাদকে অবলম্বন করে পুনঃবিবাহের ভাবনা ভাবেনি বরং সমাজে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার তাগিদে নিজের বিবাহের বিজ্ঞাপন নিজেই দিয়েছে। সেখানে 'নিজেই নিজের শর্তে' বাঁচবার দাবী হয়ত ততখানি ছিল, যতটা সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল তার। এর চেয়েও বড় হয়ে উঠেছিল তার একনিষ্ঠ প্রেমের পরিবর্তে বহুগামী স্বামীর ব্যাভিচারের প্রতিবাদ। গল্পে দাম্পত্য সম্পর্কে আধুনিক ধারণার অবতারণা করেছিলেন—

"পুরুষ বিপত্নীক হলে তাকে বিপত্নীক সেজে থাকতে হবে, এমন কোন প্রথা নাই— নারী বিধবা হলে তার বিধবা সাজবার একটা তোড়জোড়ই দেখা যায়। ... নারী আর পুরুষে এই যে পার্থক্য, একজনের পক্ষে অত্যাজ্য ধর্ম, আর একজনের পক্ষে নেহাৎ হেলাফেলা, এর ভিতর পরাধীনতার বন্ধন আর স্বাধীনতার

হামখোদাই খেয়াল আছে— আর আছে অভদ্র একটি ইঙ্গিত। বিপত্নীক ব্যক্তিকে জানানো হয়েছে, তোমাকে রাখে কে! তোমার জন্য অনেক নারী বসে আছে— গ্রহণ করো। অপরপক্ষে বিধবাকে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় কাউকে মনে মনে পছন্দ করেছ কি তোমার স্খলন হল— তুমি জাহান্নামে গেলে।"

এই আধুনিকতা বিধবা রতির মনে হঠাৎ আসত না, যদি না লম্পট স্বামী অক্ষয় 'পৃথিবীর বেশ্যার মনের কলঙ্ক আর দেহের অশুচি-স্পর্শ' তার গায়ে মাখিয়ে না দিত। পরিণীতা বধূ ও বারবণিতার কোন ভেদ ছিল না অক্ষয়ের কাছে। এই কারণেই বোন মনোমঞ্জরীর বিশ্বাস 'সতীত্ব বজায় থাকিলেই মেয়েমানুষ শুদ্ধ থাকে'ই এই তত্ত্ব গ্রহণ করেনি রতি।

পবিত্র প্রেমে সুন্দরের সাথে মিলিত হবার প্রচেষ্টাতেই পুনঃবিবাহের প্রচেষ্টা। নগর কলকাতার পুরুষদের মজলিস ও পাণিপ্রার্থী মোহনবাবুর মনের চিন্তাভাবনা থেকে জানা গেছে বিধবাবিবাহ নগর জীবনে প্রচলিত—

"হাওয়া বদলেছে। আজকার দিনেও সে সব আড়াই তন্দ্রাতুর মানুষ পুরাতন সমাজব্যবস্থা সনাতনী শক্তির সঙ্গে আঁকড়ে ধরে আছে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারলেই অনুকম্পা, পৃষ্ঠপোষণ সাহায্য আর সাধুবাদ চতুর্দিক থেকে আসবেই।"

কিন্তু গ্রামীণ সমাজ রতির এই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতে পারে না, নারী সমাজ কর্তৃক সে পরিত্যক্তা, কারণ—

'খোঁটায় খোঁটায় পুরুষগুলোকে সংস্কারের গোঁজে বেঁধে রেখেছে মেয়েরাই।'

আবার নাগরিক শিক্ষিত সমাজ মেয়েদের এই সংস্কারমুক্তিকে 'তারিফ' করলেও 'সর্বান্তকরণে শ্রদ্ধা' করতে অক্ষম। সেই অশ্রদ্ধা আর অভক্তি পোষণ করে কেবল সাংসারিক ও শারীরিক প্রয়োজনেই মোহনলাল রতিমঞ্জরীর পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত ছিল অর্থের লোভও। নিজের সংকীর্ণ ক্ষেত্রের ভিতর তার দাম্পত্য ভাবনা, রতির বৃহত্তর নিবেদন গ্রহণের উপযোগী হৃদয়বৃত্তির অধিকারী মোহনলাল ছিল না। স্বামীর সংসারে সুলভ গণিকাবৃত্তি নিয়ে পুরুষের 'লোলুপ দৃষ্টি' রতির চোখ এড়ায় না—

"... জীবনের যা প্রকৃতি তাকে ফুটিয়ে তুলে সার্থকতা দিতে এ-ব্যক্তি আসে নাই— এসেছে তাকে সাংসারিক প্রয়োজন-সিদ্ধির যন্ত্র করে নিতে।"

আর স্বামীর সংসারে পত্নীরূপ যন্ত্রটির নির্মম পরিণতি সম্পর্কেও সচেতন সে, তীব্র প্রতিবাদে গর্জে ওঠে—

"মারে... শত্রু মনে করে মারে, ভার বইতে পারছিনে বলে রাগ করে মারে, বেশ্যাসক্ত যারা তারা সুখের প্রতিবন্ধক দূর করতে মারে; কথার বিষে মারে, না খাইয়ে মারে।"

মোহনের দিক থেকে দেখলেও দেখা যায় 'স্ত্রীর সমগ্র মূর্তি আর সূক্ষ্ম রূপ' তার চোখে সঠিকভাবে পড়েনি। নারীসত্তার স্বরূপ দৈনন্দিন দাম্পত্যের মাঝে ফুটে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথ

তাঁর 'পয়লা নম্বর' গল্পে জানিয়েছিলেন যে অধিকাংশ পুরুষই স্ত্রীকে পায় না, এবং সেই না-পাওয়ার বোধটুকুও তাদের মধ্যে জাগে না। এখনেও মোহনের তেমনই অবস্থা, অক্ষয়েরও তাই। তার প্রতি স্ত্রী রতিমঞ্জরীর সীমাহীন ঘৃণা তার চোখে পড়েনি, বরং আপাত সোহাগে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল সে। রতির একাধিক বার মৃত সন্তান প্রসবও অক্ষয়কে উৎকণ্ঠিত করেনি, কারণ, সন্তানহীনা স্ত্রী তার কাছে জৈবিক প্রবৃত্তির উপকরণ হয়ে রয়ে গেছে। সমাজ-সংসারের কুঞ্চিত কটাক্ষকে সহ্য করেও নতুন জীবন শুরু করতে গিয়ে মোহনের চোখে মুখে 'লালসা' আর 'শারীরিক উত্তেজনা' লক্ষ্য করে বিবমিষা জেগেছে তার। অন্তরের 'নিরবিচ্ছিন্ন আকুল আহ্বান'— যা প্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হতে চেয়েছিল তাই তাকে নিয়ে গেছে গণিকাবৃত্তির দিকে।

রতিমঞ্জরীর সম্পূর্ণ বিপরীতে প্রথাগত দাম্পত্য ভাবনার নারী প্রতিনিধি তার বোন মনোমঞ্জরী। জীবনের সার্বিক সুখ সে খুঁজে পেয়েছে দাম্পত্যেই। হয়ত বা সেই বিশ্বাসই তার মূল ভিত্তি। ইন্দ্রজিতেশ্বরানন্দের স্ত্রী রণদাকিঙ্করী, সরোজিনী অথবা বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনী সবাই একই ভাবনায় অবস্থান করেছে। 'নিখুঁত পতিব্রতা' মনোমঞ্জরীকে নিরাপদে রাখবার প্রকৃত হেতু সে নিজেও জানে, আর তাই—

> "... সে সাজে দেহকে সজ্জার পারিপাট্যে চমকপ্রদ আর লোভনীয় করে রাখে।...
> এসে সে দেখে মনোমঞ্জরী যৌবন জাগিয়ে একান্ত তার জন্য অপেক্ষা করে আছে...
> স্বামীর ব্যগ্র বাহুর ভিতর ধরা দিয়ে চুম্বন গ্রহণ করে সে নিজেকে সার্থক করে।"

সীমাবদ্ধ দাম্পত্য ভাবনায় মনোমঞ্জরীর কাছে যা সার্থক, রতিমঞ্জরী সেখানেই দেখেছে 'কুরুচিপূর্ণ অপব্যবহার' আর 'প্রেমশূন্য কলুষ লোলুপতা।' স্বামীর বহুগামিতার পরিচয় পাওয়ার সময় থেকেই শুরু হয়েছিল তার বৈধব্য। তাই স্বামীর মৃত্যুর পর ঘোমটার আড়ালে ঢাকতে হয় তার 'শুষ্ক বাষ্পহীন চক্ষু' এবং 'নির্বেদনা'। আর শেষ পর্যন্ত চরিত্রগত ভাবে স্বামীরই দোসর, পাপের দ্বিতীয় দূত মোহনলালকে নিয়ে অর্থহীন দাম্পত্যে প্রবেশ করেনি রতিমঞ্জরী।

'কলঙ্কিত সম্পর্ক' গল্পে মাখনবালাও গ্রহণ করতে পারেনি তার ব্যাভিচারী স্বামী সাতকড়িকে। বাইশ তেইশ বছরের বিধবা মেয়েকে দুজন বন্ধু সহ জোর করে ভোগ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল সাতকড়ি। দেড় বছর সুদীর্ঘ কারাবাসের পর তার বাড়ি ফিরে আসবার প্রতীক্ষায় সমগ্র পরিবার উদগ্রীব হয়ে থাকলেও স্ত্রী মাখনবালা ধর্ষক স্বামীকে গ্রহণ করতে অক্ষম। স্বামী আসার পূর্বরাত্রেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। দিনের আলোয় বাড়ি ফিরতে লজ্জিত হলেও রাতের অন্ধকারে যখন ফেরে, মাখনবালার মনের অন্ধকার তখনও কাটে না। তাকে স্বাগত জানাতে যখন সবাই উচ্ছসিত তখন—

> "ছোট বউ ব্যাধিকাতর দুর্বল ব্যক্তির মতো জড়সড় হইয়া এক কোণে দেয়ালের সঙ্গে গা ঠাশিয়া বসিয়া আছে।"

স্বামীর প্রতি এই অবহেলা আসলে দাম্পত্যের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি। উনিশ শতকে *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসে জমিদারকন্যা ও জমিদারবধূ আত্মাভিমানী ভ্রমর দাম্পত্যে ভালোবাসা ও বিশ্বাসের পরিপূরক অবস্থানের পরিচয় দিয়ে স্বামী গোবিন্দলালকে পত্রাঘাত করেছিল। জাঁদরেল শাশুড়ি বিরাজবালার সংসারে ততখানি গলার জোর মাখনবালার ছিল না। বড় জা গোলাপ, মাখনের যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারলেও সরাসরি প্রতিবাদের সাহস বা প্রচেষ্টা তার ছিল না। কিন্তু দাম্পত্যের ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিল বলেই মাখনের প্রতি সহানুভূতিতে খামতি ছিল না। প্রজন্মগত ব্যবধান বা ব্যক্তিগত চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে শাশুড়ি বিরাজের দাম্পত্য ভাবনা পৃথক, তার কাছে পতিনিষ্ঠার নমুনা স্বামীর এঁটো থালায় ভাত খাওয়া। এই কারণে সাতকড়ির—

> "উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্রে ছোট বউ ভাত লয় নাই দেখিয়া, অর্থাৎ স্বামীর প্রতি বধূর এই ঘৃণা প্রকাশে বধূর প্রতি দারুণ অপ্রবৃত্তি জন্মিয়া বিরাজের যে কেমন ঠেকিতে লাগিল তাহা বলা যায় না।"

অবশ্য এ চিত্র এ গল্পে প্রথম নয়, ঋগ্বেদেই আছে—

> 'ভুক্তোচ্ছিষ্টং বধ্বৈ দদ্যাৎ'

অর্থাৎ পুরুষ খেয়ে এঁটোটা স্ত্রীকে দেবে। এই বিশ্বাসে যিনি থাকেন, ধর্ষক পুত্রের জন্য অনায়াসেই স্নেহের আঁচল বিছিয়ে দিতে পারেন সেই মা। যার কাছে নারীত্বের মূল্যায়ন প্রশ্নহীন আনুগত্যে। লম্পট স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর প্রতিবাদের কোন স্থান সেখানে নেই। সাতকড়ির বাহুপাশে যাওয়ার প্রতিবাদ করলে তাই মাখনকে গভীর রাতে ধাক্কা দিয়ে সদর দরজার বাইরে বের করে দেন বিরাজ। সাতকড়ি নারীলোলুপ, ব্যাভিচারী, লম্পট— এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। স্ত্রীর প্রতি তার ভাবনাগত নির্লজ্জতা ধরা পড়ে যখন সেই বিধবা বৈষ্ণবীর সঙ্গে স্ত্রীর রূপের তুলনা করে। আর এই ব্যাভিচারী দাম্পত্যকে প্রশ্রয় দিয়ে চলে মা বিরাজ।

পুত্র ও পুত্রবধূর দাম্পত্যের মাঝে বিরাজের মত শাশুড়ি যেমন আছেন তেমনই সুভদ্রার মত অনুভূতিশীল শাশুড়িকেও পাই 'চন্দ্র-সূর্য যতোদিন' গল্পে। গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে অছে বহুবিবাহ সমস্যা। অতুল সুর, তাঁর *ভারতের বিবাহের ইতিহাস* গ্রন্থে জানিয়েছেন—

> "১৯৫৫ সালে হিন্দুবিবাহ আইন প্রণীত হবার পূর্ব পর্যন্ত স্বামী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে পারতো। কিন্তু সে কারণে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হতো না। এককথায় সনাতন হিন্দু সমাজে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক কখনও প্রত্যাহৃত হবার অবকাশ ছিল না। তবে স্ত্রী ব্যাভিচারিণী হলে তাকে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হতো এবং স্ত্রী হিসাবে যে তার পূর্বমর্যাদা হারাতো।"

হিন্দু সমাজে উচ্চবর্ণের মধ্যে সেই সময় বিচ্ছেদ ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। এই গল্পে দীনতারণ বাবার আদেশ শিরোধার্য করে স্ত্রী ক্ষণপ্রভা বর্তমানে শ্যালিকা প্রফুল্লকে বিবাহ করে। জগত্তারণের পুত্রের বিবাহ বিষয়ক এই সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল বেয়াই-এর সম্পত্তি গ্রাস। দুই বোনের পাশাপাশি অবস্থান কোন বাহ্যিক লড়াই সৃষ্টি না করলেও ক্ষণপ্রভার যন্ত্রণা বার বার চোখে পড়ে শাশুড়ি সুভদ্রার—

> "তার আকুলি-ব্যাকুলি সংশয় উৎকণ্ঠার সীমা পরিসীমা নাই— সন্তানের দৌলত দেখাইয়াই যে স্বামীকে ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছে।"

কিন্তু প্রফুল্লর প্রফুল্লতা অতিক্রম দীনতারণ সন্তানস্নেহের নিবিড় আলিঙ্গনে ধরা দিতে পারে না। কারণ 'যৌবনই হইল সবার বড়ো।' তাই ক্ষণপ্রভার সন্তানকে প্রফুল্লর কোলে দেখে দীনতারণের স্নেহবুভুক্ষা মেটে না, বরং আকাঙ্ক্ষা করে প্রফুল্লর গর্ভজাত সন্তানের জন্য। ক্ষণপ্রভা যখনই দেখেছে তার প্রিয়ারূপ সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয়ে গেছে প্রফুল্লর নবযৌবনের ছটায় তখনই তার কল্যাণশ্রী মাতৃমূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে, সন্তানের জননী হিসাবে স্বামীর কাছে প্রাধান্য অর্জনে হয়েছে সচেষ্ট। কিন্তু ভোগের ক্ষেত্রেই স্বামীর আগ্রহ অধিক। প্রথমে নিজের জন্য ক্ষণপ্রভা উৎকণ্ঠিত ছিল, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা— প্রীতি এবং সন্তান ধারণকেও মিথ্যা বলে মনে হয়েছিল। পরে বুঝেছে প্রফুল্লও তারই 'সঙ্গিনী'— তার পরিণতিও অনুরূপই হবে। গার্হস্থ্য জীবনের পটভূমিতে রচিত এই গল্পে লেখক দাম্পত্য ভাবনার বিশ্লেষণ করেছেন 'স্থূল জৈব দৃষ্টিকোণ থেকে।' বিবাহিত সম্পর্কের মাঝে সতীন-সমস্যার সূত্র ধরেই এসেছে 'উপেক্ষার অপমান, শাশুড়ির সহানুভূতির ভাবনা, অন্যদিকে দেহের ক্ষুধা।' গল্পের পরিণতিতে ক্ষণপ্রভা পাগল হয়েছে, তার আগে স্বামী সম্পর্কে যে ভাবনা উদয় হয়েছে, 'কলঙ্কিত সম্পর্ক' গল্পে মাখনবালার ধর্ষক স্বামী সম্পর্কিত ভাবনার থেকে খুব দূরে তার অবস্থান নয়—

> "এই শয্যায় প্রবেশ করিতে তার গা ঘিন-ঘিন করিতেছে... অদূরবর্তী ঐ লোকটা কেবল একটা মাংস পিণ্ড— যেমন কদর্য তেমনি লোলুপ; তার মাংসাশী দেহটা যেন সর্বাঙ্গ দিয়া হাঁ করিয়া আছে— মন দিয়া ঐ দেহ স্পর্শ করা সে যেন স্মরণাতীত কোন যুগে পরিত্যাগ করিয়াছে—"

শেষ পর্যন্ত স্বামীর ভুক্ত হয়ে উন্মাদিনী হয় ক্ষণপ্রভা, তবে অপত্যের প্রতি স্নেহ রয়ে যায়, স্থির অবিচল।

শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করে বাল্যবিবাহ এককালে তুমুলভাবে চলেছিল। আধুনিক শিক্ষার ক্রম অগ্রগতিতে তা বহুলাংশে হ্রাস পেলেও একবিংশ শতকেও তা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি। ১৯০১-১১ সালের মধ্যে বাঙালি নারী ও পুরুষের বিবাহের বয়সের গড় ছিল যথাক্রমে ২০ ও ১৩। ১৯২৯-এ সারদা আইন বা বাল্য বিবাহ আইনে বিয়েতে বর ও কনের

নিম্নতর বয়স ধার্য হয় যথাক্রমে ১৮ ও ১৪। ১৯৪৯-এ আইনটি সংশোধন করে এক বছর বাড়ানো হয়। ১৯৫৪ তে বিশেষ বিবাহ আইনে বর-কনের বয়স ঠিক হয় ২১ ও ১৮। বিশ শতকের প্রথমার্ধের প্রেক্ষাপটেই 'আদি কথার একটি' গল্পে জগদীশ গুপ্ত বিবাহ ঘটালেন এমন এক বর-কনের সেখানে— 'ছেলে তাগড়া জোয়ান, মেয়ে একরত্তি।' এই অসম দাম্পত্যের চিত্র অঙ্কন করতেই এ পটভূমির অবতারণা গল্পকার করেননি কারণ, সুবলের 'মনের কথা' অন্য। তেইশ-চব্বিশ বছরের জোয়ান সুবলের যোগ্য গৃহিণী হয়ে উঠতে পাঁচ বছরের খুশির অনেক দেরি। আর—

'সহধর্মিনী আজকাল কেউ চায় না, সুবলরা আরো চায় না...'

খুশিকে বিয়ে করেছে পরবর্তীকালে সে সুন্দরী হয়ে উঠবে এই আশায়, কিন্তু ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা ও তার বুকে জেগে আছে— 'তার লক্ষ্য ছিলো ঐ কাঞ্চন'— যে খুশির মা তথা সুবলের শাশুড়ি। মিথ্যা কোমর ব্যথার ভান করে কাঞ্চনকেই কাছে পেতে চায় সে। এবং ব্যর্থ মনোরথ হয়ে স্ত্রী খুশিকে অকারণে আঘাত করতে থাকে। নির্মম নির্দয় পুরুষের কবল থেকে মেয়েকে রক্ষা করবার প্রয়োজনে উপলব্ধি করে কাঞ্চন, সে বোঝে—

> "পুরুষত্বের পূর্ণ বিকাশে সর্বদেহের অসাধারণ তেজপ্রাচুর্যে একজন যেন পৃথিবীর সমস্ত মর্মহীন রসহীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া এখন শুধু সর্বব্যাপী ক্লান্তিতে ভারাক্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পাশে পড়িয়া আছে একটি অতিশয় শিশু।"

একদিকে মেয়ের ভবিষ্যৎ অন্যদিকে নিরাপত্তা— মেয়ের দাম্পত্যে প্রবেশ ঘটেই শেষ পর্যন্ত কাঞ্চনের। হয়ত বা কাঞ্চনের অবদমিত প্রবৃত্তিরও জাগরণ ঘটছিল ক্রমশ—

> "কাঞ্চনের দেহ ও মনের সমগ্র চেতনা একটি মাত্র বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতে লাগিল— যেমন তীব্র স্রোতের মধ্যে জলের পাক।"

শালীনতা ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব কাঞ্চনের মধ্যে দেখা গেলেও সুবলের মধ্যে নেই। তাই সুবল 'ছিঁচকে' হয়ে ওঠে এবং—

> "ছোঁ ছোঁ করিয়া বেড়ায়, উঁকি-ঝুঁকি মারে, শুভযোগের ক্ষণটি খোঁজে।"

যদিও সুবলের এই অধঃপতনের শাস্তি নির্মমভাবে উভয়কেই সহ্য করতে হয় সামাজিক বিচারের কাঠগড়ায়, তবু পাপের দায়ভার যেন কাঞ্চনের প্রতি শাস্তিতেই বেশি কঠোর— 'তার পিঠের উপরকার রক্তমাখা কাপড়ের দিকে চাহিয়াই সে দিকে কাহারো পা উঠিল না।'

কাঞ্চনের প্রতি সমাজ কর্তৃক নির্মম শারীরিক নির্যাতন ঘটেছে, অন্যদিকে 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পে অভয়া নিজেই মানসিক নির্যাতন সহ্য করে গেছে তার দ্বিবিধ মূল্যবোধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। শিশুকন্যাকে নিয়ে স্বামীকে ত্যাগ করে অতুলের সঙ্গে কুলত্যাগিনী হয়েছিল। এই অপরাধবোধজনিত শঙ্কা অভয়ার মনে সদা জাগ্রত। অথচ সমগ্র গল্প জুড়ে অতুল চরিত্রের কোন অন্ধকার দিকের প্রতি সেভাবে নির্দেশ করা হয়নি। কন্যাসহ অভয়াকে

বলপূর্বক অতুল তুলে এনেছিল এমন কথাও অভয়া বলেনি। এবং অভয়া ও অতুলের পরবর্তী দাম্পত্য জীবনের মধ্যে অতুলের ঔরসজাত সন্তান নয় বলেই শান্তি ও অতুলের স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি অভয়া। তাদের শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক মুক্ত আলোচনাকে সহজ মনে গ্রহণ করতে পারেনি। হয়ত তার প্রধান কারণ শান্তি, অতুলের নিজের মেয়ে নয় বলেই। প্রসঙ্গত স্মরণে আসে বিমল করের 'আত্মজা' গল্পটি। যূথিকাও সেখানে স্বামী হিমাংশু ও আত্মজা পুতুলের মধ্যে এরকম সম্পর্কই খুঁজে বেড়িয়েছিল। পুতুলের মধ্যেই হিমাংশু খুঁজে বেড়িয়েছিল কিশোরী যুথিকাকে—

"অস্বীকার করবে কি হিমাংশু, পুতুলের চুল, চোখ, সর্বাঙ্গের ঘ্রাণ ওর চিত্তে যে শিহরণ জাগিয়েছে তার মধ্যে কোন আনন্দের স্বাদ ছিল না।"

হিমাংশুই ভেবেছে, সে "পিতা নয়, পশু। যার দৃষ্টি সুস্থ মানুষের নয়, জানোয়ারের"। এই প্রবৃত্তির প্রকাশ কিন্তু 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পে নেই। তবে কী শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়েই অভয়ার হৃদয়রাজ্য অধিগ্রহণ করেছিল অতুল, তাই মেয়ের সঙ্গে সেই নিয়ে আলোচনায় অভয়া ভিন্ন কিছুর আভাস পেয়েছিল। অতুল আর অভয়ার দীর্ঘ দাম্পত্যের মাঝে অভয়ের শঙ্কা ছাড়াও সবচেয়ে দুর্বল ভিত হল বিশ্বাসের অভাব। অপরাধবোধ অতুলের ভিতরও ছিল তাই 'নিরীহ সেই লোকটিকে দেখিয়াই থতমত খাইয়া' অতুলের 'পলায়ন করিবার সে কী চেষ্টা।' অপরের স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে সংসার তৈরী করে তার মনেও ভীতি জন্মেছে। পাশপাশি লক্ষণীয় ছোটগল্পের এই সংক্ষিপ্ত অবয়বে স্ত্রী অভয়ার সঙ্গে অতুলের কেন স্বাচ্ছন্দ্য আলাপের প্রসঙ্গ নেই, অভয়ার অবস্থান সংসারের প্রান্তে। অতুলকে সে চিনতে পারেনি অথচ গভীরভাবে চিনেছে, তাই মেয়ে শান্তিকে তীব্র হাহাকরা নিয়ে বলে ফেলে—

"আমি পাগল হয়ে গেছি; আমার বুক পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। বল্ সত্যি করে শান্তি, ও তোকে নষ্ট করেনি তো?"

দীর্ঘকাল একসঙ্গে বসবাস করা পর তার মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা-স্নেহ-করুণা কিছু খুঁজে পায়নি অভয়া, কেবল দেখেছে এক ভ্রমরবৃত্তি—

"ও ইচ্ছে করলে যে কোন স্ত্রীলোককে বশীভূত করতে পারে।"

অর্থাৎ একসময় অভয়া তার বশীভূত হলেও বর্তমানে তার মোহমুক্তি ঘটেছে। অথচ তাদের একত্র বাস চলমান— অভ্যাসের গতানুগতিকতায় অথবা নিরাপত্তার তাগিদে।

কিন্তু এই নিরাপত্তা সেখানে প্রয়োজনহীন কিন্তু গতানুগতিক দাম্পত্যে যখন ক্লান্তি আসে তখন সেখান থেকে বেরিয়েও গেছে জগদীশ গুপ্তের গল্পের নায়িকারা। প্রেম নয়, প্রবৃত্তির দাহই তাদের নিয়ে গেছে সেই পথে। 'রসাভাস' গল্পের সূর্যমুখী তাই স্বামী মুকুন্দলালের অন্নে পদাঘাত করে চলে আসে তার ব্যাভিচারী জীবনবৃত্তে—

"স্বামীর অন্নে উদারপূর্তি করিতে অস্বীকার করাই সূর্যমুখীদের অলিখিত

দাম্পত্য-আইনের কেতাবের বিবাহ-বিচ্ছেদের চূড়ান্ত বোধ— আপিল নাই; নিষেধাজ্ঞা চলিবে না।"

উচ্চবর্ণের মানুষদের মত বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রটি তাদের জটিল নয়, সরল ও সংক্ষিপ্ত। একদিকে প্রৌঢ় গৌরগোপালের অর্থ, অন্যদিকে যুবক হৃদয়নাথের দেহ— দুয়ের মধ্যেই সাম্য রেখে সূর্যমুখী তার ব্যভিচারের পথে যাত্রা করেছে। কেবল দাম্পত্য নয়, সে কোন সম্পর্ক যে সূর্যমুখীর প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ তার পরিচয় কেবল হৃদয়নাথ নয়, পাঠকও পায় গল্পের অন্তিমে। 'বোনঝি গুঞ্জমালা' গল্পে মহেশ্বরী হাড়িনীর বোনঝিও পালিয়েছিল এক ছোঁড়ার সঙ্গে। কিন্তু তার পালিয়ে যাওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য আলোকিত হয়নি গল্পে, কারণ সমগ্র গল্পটিই তার মাসির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। একদিকে সে স্বামী পরিত্যক্তা অন্যদিকে সদ্য মা-হারা মেয়েটিকে মাসি নিজেই পাপের পথে নিয়ে চলেছিল। সেই জীবন থেকে মুক্তি পেতেই নতুন জীবনের পথ বেছে নিয়েছিল, হয়ত কিছুটা চাতুর্যের পথ অবলম্বন করতে হয়েছিল তাকে। স্বামী পরিত্যক্তা গুঞ্জা সম্পর্কে মাসি মহেশ্বরীর ধারণাও খুব উচ্চমার্গের ছিল না, তাই স্বামীর ভাত জোটেনি বলেই তাকে দেহ-ব্যবসায় নামার জন্য প্ররোচিত করে। স্বামীহীন অবস্থার দুরবস্থা সম্পর্কে মহেশ্বরী সচেতন ছিল না পূর্বে, তার গুরুত্ব উপলব্ধি করল স্বামীর মৃত্যুর পর। স্বামীর মূল্য জীবিত অবস্থায় ছিল 'শূন্য'—

"কিন্তু শূন্য যে একটি সংখ্যা মহেশ্বরী তা জানিত না— হুঁশ হইল পরে; প্রাণরামের মৃত্যুর পর সে বুঝিল, শূন্যটি দক্ষিণে থাকায় তাহার মূল্য, অর্থাৎ শক্তি দশগুণ বাড়িয়াছিল।"

জীবিত অবস্থায় স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল 'আটপৌরে রকমের।' স্বামীর মৃত্যুর পর অতিরিক্ত স্বামী সোহাগিনী হয়ে ওঠে— কিছুটা মনের গভীর আকাঙ্ক্ষা থেকে আর কিছুটা একাকী জীবনের দুর্দশা ভুলে থাকতে। হয়ত সব নারীর স্বামীর কাছ থেকে আকাঙ্ক্ষা থাকে একই রকমের, কিন্তু পরিবেশ ও প্রতিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান চাহিদার রূপ ও রসকে বদলে দেয়। সুবোধ ঘোষের 'বারবধূ' গল্পের বারবণিতা লতাও প্রসাদকে ঘিরে এমনই দাম্পত্য নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিল, যদিও তা সফল হয়নি। দাম্পত্যের নির্মাণের পটভূমিও নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

এই সীমাবদ্ধতার কারণে ব্রাহ্মণ কানুর সঙ্গে শূদ্রাণী রানুর বিবাহ ঘটেনি 'অরূপের রাস' গল্পে। দুজনের পৃথক সংসার হয়েছে। কেউই দাম্পত্য জীবনে অসুখী হয়েছে বলে গল্পকার দেখাননি। রানুর একটি সন্তানও হয়েছে— বেণু। কানুর স্ত্রী ইন্দিরা 'ভালোমানুষ'। অথচ অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা উভয়ের মধ্যেই আছে, বিশেষত রানুর। বিবাহ পূর্বেও কানুর নির্লিপ্তির জন্য তীব্র অভিমান প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা রানুর মনে প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল বলেই তাকে এড়িয়ে যেতে অতিমাত্রায় সচেষ্ট হয়ে উঠেছে, স্বামী বসন্তের চাকুরিসূত্রে যখন আবার কানুর বাড়ির কাছেই বাসা ভাড়া নিতে হয়েছে, ইন্দিরার

সঙ্গে গাঢ় বন্ধুত্বও গড়ে তুলেছে রানু। অথচ ইন্দিরা ও রানুর এই সম্পর্কের বৃত্ত থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত কানু। রানুর প্রতি কানুর যে দৃষ্টি— কানুর কথাতেই—

"আমিই তাহার জ্বলন্ত রূপ আর দুরন্ত যৌবনের দিকে চাহিয়াছিলাম— নেত্রে সেই উন্মত্ত সম্ভোগ জীবনের প্রতিদিনের বস্তু নয়, চোখের পলক পড়িতে চাহে নাই।"

কানুর 'অন্তরের তৃষ্ণার্ত কলুষ অগ্নি তরঙ্গ' হয়ত রানুর স্ফুলিঙ্গ পেয়ে দুটি দাম্পত্যকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে— এই আশঙ্কায় রানু সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছে কানুকে। রানুর 'অঙ্গবিচ্যুত এই শিশু'-কে দেখেও কানুর 'চক্ষে লালসা' জেগে ওঠে। তীব্রভাবে রানুকে চেয়ে না পাওয়া এই নিবিড় বেদনা তার মনে স্থবিরত্ব এনে দেবে এই ভাবনাও 'দুরু দুরু শঙ্কা' জাগায়। বিবাহিত জীবন ভাবনায় রানু একটা জায়গা নিয়েই নেয়।

রানুর মনের ভাবনা সরাসরি প্রকাশ পায়নি এ গল্পে— অনুমান করা যায় তার কানুপ্রীতিও সমধর্মী। শেষ পর্যন্ত ইন্দিরার অঙ্গ থেকে কানুর 'স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক রক্ত পূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে।' নিজে তৃপ্ত হয়েছে কতখানি তা জানা যায় না, তবে কানুকে পরিতৃপ্তি দিয়ে মুক্তি ঘটিয়েছে কামনার বেড়াজাল থেকে। ইন্দিরার প্রতি রানুর যে সম্ভোগেচ্ছা তাকে আপাতভাবে 'Lesbianism' বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু ইন্দিরার ও রানুর মাঝে আছে কানুর অবস্থান; রানুর মূল গন্তব্য কানুর শরীর, সেখানে পৌঁছানোর একটা মাধ্যম হিসাবে 'ভালোমানুষ' সরলমতি ইন্দিরার শরীরকে 'ইউজ' করেছে রানু। ইন্দিরার মন ও শরীরের প্রতি আলাদা কোন আকর্ষণ রানুর ছিল না। স্বামীর বদলির সূত্রে যাবার সময় হয়েছে তখন প্রেমের দাবী মেনেই শরীরের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নিতে চেয়েছে। তথাকথিত সামাজিক শুচিতা ও দাম্পত্যের প্রতি বাহ্যিকভাবে একনিষ্ঠ থেকে নিজের আত্মতৃপ্তি ঘটিয়ে নিয়েছে। গভীর প্রেমকে বস্তুনিষ্ঠভাবে রূপ দিয়েছে Fetishism বা বস্তুকামিতার মধ্য দিয়ে। সংযম ও অবদমন হয়ত উভয়ের দাম্পত্যকেই ক্রমে ক্রমে বিপর্যস্ত করে দিত, রানুর ভিন্নতর সাহসী পদক্ষেপ ইতিবাচক ভাবে তাদের প্রেমকে বা বলা ভালো দেহজ চাহিদাকে ভিন্নতর পরিণতি ও পরিতৃপ্তি দিয়েছে।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী জীবনের ইন্দ্রিয়পরতা ও 'সাহিত্যের আদিরস'কে ভিন্ন জিনিস বলে মনে করেছেন—

> "স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক আকর্ষণ লইয়া কবিতা বা গল্প লিখিতে গিয়া যাঁহারা প্রেম মিথ্যা কাম সত্য, অথবা কাম মিথ্যা প্রেম সত্য, এই দুইটি তথ্যের যে কোনোটিকে প্রমাণ করিতে চান সাহিত্যে তাঁহাদের স্থান নাই। ক্ষমতা থাকিলে তাঁহারা দ্বিতীয় বাৎস্যায়ণ, কল্যাণমল্ল অথবা হ্যাভেলক এলিস হইতে পারেন। তাঁহাদের যে গৌরবে কেহ আপত্তি করিবে না। কিন্তু সাহিত্যের কথা স্বতন্ত্র।"

এই স্বতন্ত্র ভাবনাতেই জগদীশ গুপ্ত বেণুকর মণ্ডল ও জানকীর দাম্পত্য সম্পর্কের গল্প

নির্মাণ করেছেন। স্ত্রীর কাছে 'আঠারো কলার একটি'র পরিচয় পেয়েছে সাংঘাতিক ভাবে। স্ত্রীর কৌতুকের যে নিদর্শন আছে তাকে নির্মম বলা যায় না তবে অভিনব। শুষ্ক জমিতে মাগুর মাছ পুতে জানকী বাইরের লোকের কাছে অপ্রস্তুত করেছে বেণুকরকে। কিন্তু এ গল্পে দাম্পত্যের ভিন্ন সুরও আছে। চার বছরের বিবাহিত জীবনে জানকীর নৈকট্য বেণুকরের যৌবন উদ্দামতাকে নতুন কোন রস দিতে পারে না। তাই জানকীর 'দর একটু কমে এসেছে' কারণ—

> "দীর্ঘ চারটি বছরের অবিরাম সাহচর্য-বশত স্ত্রীর ভঙ্গি আর গঠন যদি চোখের সামনে পুরনো হয়ে উঠতে থাকে তবে উপায় কী! প্রতিরোধ করবার উপায় মানুষ খোঁজে, কিন্তু পায় না। এই নিরুপায় অবস্থাটা বড়োই লোভের সৃষ্টি করে..."

তাই পনেরো বছরের স্ত্রী উনিশ বছরের হতেই আগ্রহ কমতে শুরু করে বেণুকরের। 'রূপের পর রূপের আবর্তন আর রসের অন্তে রসের উদ্ভব' দেখার প্রতীক্ষায় বসে থাকে বেণুকর। অনিঃশেষ যৌবনের ক্ষুধা অতৃপ্তি ডুবিয়ে রেখেছে তাকে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় এ ক্ষুধা নিবৃত্তির পথে সে বহুগামিতার আশ্রয় নেয়নি। বরং স্ত্রীর কাছেই আঠরো কলার অনুসন্ধানে ফিরেছে। রসিকা 'যুবতী বউ' ছত্রিশ থেকে চুয়ান্ন কলার উল্লেখ করে বেণুকরকেই লজ্জায় ফেলে—

> "মনে-মনে যার অভাব অনুভব করে বেণুকর তৃষিত হয়ে উঠেছিল সেই জিনিসটা দিতে চাইতেই ব্যাপার কেমন বেখাপ্পা হয়ে উঠল।"

দাম্পত্যে ব্যক্তিগত কিছু উপলব্ধি অব্যক্ত থাকলেই তা মাধুর্যে পূর্ণ হয়। সিমোন দ্য বোভেয়ার তাঁর *দ্বিতীয় লিঙ্গ* গ্রন্থে জানিয়েছেন—

> "বিয়ের রাত্রি, যৌনক্রিয়াটিকে পরিণত করে এক পরীক্ষায়, যার মুখোমুখি হতে উভয়েই ভয় পায়, যদি তারা উত্তীর্ণ হতে না পারে। প্রত্যেকেই নিজের সমস্যা নিয়ে এত উদ্বিগ্ন থাকে যে অন্যের ব্যাপারে উদারভাবে কিছু চিন্তা করতে পারে না, এটা ঘটনাটিকে দেয় এক ভীতিজনক গম্ভীরতা; এটা আশ্চর্যজনক হয় যে এই ঘটনা নারীটিকে স্থায়ীভাবে করে তোলে কামশীতল।"

গল্পে জানকীর যৌনপ্রেম দাম্পত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়ায়নি, এমনও নয় যে কামশীতল। অন্যদিকে তার দাম্পত্যের স্বরূপ ধরা পড়ে 'চার বছর ধরে কায়মনোবাক্যে সহযোগিতার' মধ্যে। কিন্তু সেই সহযোগিতার স্বরূপ উপলব্ধি করে রসগ্রহণ সম্ভব হয় না, যখন মানুষ 'মনে মনে স্বভাবতই অধার্মিক।' কটাক্ষ ও কৌশলের জন্য অপেক্ষা করে বেড়ায় সেই মন। গল্পটি ইতিবাচক ঘটনায় পরিসমাপ্তি ঘটলেও তার মধ্যে নারী ও পুরুষের দাম্পত্য ভাবনার ভিন্ন মূল্যবোধ স্পষ্টই রূপ পেয়েছে।

পত্নীর মৃত্যুর পর পুরুষের পুনর্বার দার পরিগ্রহ বহু বিবাহ (পত্নী বর্তমানে পুনর্বিবাহ)-এর তুলনায় সহজলভ্য। এই যুক্তির দ্বারে দাঁড়িয়েই বিধবা রতি নিজের পুনঃ

বিবাহের বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। সমাজের তীব্র নিন্দায় জর্জরিত হতেও হয়েছিল। এই গঞ্জনার সম্মুখীন শশাঙ্ক কবিরাজ ('শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী') বা ভূতনাথ কিংবা তার বাবাকে ('পয়োমুখম্') হয়ে হয়নি। শশাঙ্ক প্রথম স্ত্রী ভোলাদাসীর মৃত্যুর পর শ্বশুরালয় ত্যাগ করে স্বাধীনভবে জীবিকা নির্বাহ ও পুনঃবিবাহের প্রস্তুতি নেয়। এমনকি প্রথম বধূর গহনাগুলিও হস্তগত করতে সচেষ্ট হয়, কিন্তু সুপথ-কুপথ জ্ঞানহীন সম্বন্ধীর মেজাজের সামনে দাঁড়াতে পারে না। দ্বিতীয় পত্নী ইন্দিরার খুব স্পষ্ট উপস্থাপন এ গল্পে ঘটেনি। তার 'উদার' চরিত্রের বিবরণ শশাঙ্কের মুখেই শোনা গেছে, সেখানে সে কতখানি 'আপন মনের মাধুরী' মিশিয়েছে তা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। মৃত সতীন এবং তার বাবা মা সম্পর্কে ইন্দিরার শ্রদ্ধাভক্তি ও অলংকারের প্রতি উদাসীনতা কতখানি আন্তরিক তা সন্দেহের অবকাশ রাখে। আসলে সাধারণ বাঙালি পুরুষ যে আদর্শ স্ত্রী চরিত্র অঙ্কন করে থাকেন তারই 'স্কেচ' বন্ধুদের সামনে উপস্থাপন করেছে শশাঙ্ক। তবে স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনার প্রসঙ্গে যেখানে 'হৌ হৌ করে' বমি করার বিবরণ দিয়ে প্রকাশ করেছে তা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের পারস্পরিক সম্ভ্রমবোধকে ব্যহত করেছে।

'পয়োমুখম' গল্পে অর্থনৈতিক লোভ কিভাবে মানুষের হিংস্র প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে তারই স্বরূপ দেখিয়েছেন গল্পকার। একের পর এক পুত্রবধূকে হত্যা করেছেন 'শ্রীকৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা কবিভূষণ মহাশয়' কেবল পুত্রের পুনঃবিবাহ দিয়ে যৌতুক হিসাবে অর্থ আদায়ের লোভে। এই ভাবনার বহুদূরে অবস্থান পুত্র ভূতনাথের— প্রথমা স্ত্রী ন বছরের মণিমালিকা তার খেলার সঙ্গিনী। স্বামী তাকে 'রাগায়, কাঁদায় আবার খিলখিল করিয়া হাসায়ও।' দ্বিতীয় স্ত্রী অনুপমা আর খেলার সঙ্গিনী নয়, 'যৌবনের সহচারী', তাই তার কটু ও অহংকারী ব্যবহারও মুছে যেত তারুণ্যের তেজে—

> "অনুপমার সমস্ত অকারণ নির্মমতা অতৃপ্ত তৃষ্ণার খরতালে বাষ্প হইয়া দেখিতে দেখিতে ভূতনাথের মনোরাজ্য হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইতো— চক্ষুর সম্মুখে জ্বলিতে থাকিতো তার দেহখানা— ইন্দ্রজালের আলোকাৎসবের মত রূপ, তার চিরবিলসিত বসন্তের কুসুমোক্ষসবের মত যৌবন.."

খেলার সঙ্গিনী বা 'যৌবনের সহচারী'— কোন বধূরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন করতে পারেনি ভূতনাথ। তখনও স্ত্রী সম্পর্কে প্রকৃত দায়িত্ববোধও গড়ে ওঠেনি। তৃতীয় পত্নী বীণাপানিকে বিবাহের পূর্বে কলাপ-মুগ্ধবোধ ছাড়াও পরবর্তী গ্রন্থ পড়ে ভূতনাথ 'পুরোপুরি একজন কবিরাজ'। তৃতীয় পত্নী বীণাপানির সঙ্গে তার সম্পর্কও অনেক শান্ত ও সমাহিত। মণির সঙ্গে চলত শিশুক্রীড়া, অনুপমাকে গ্রহণ করেছিল যৌবনের লালসায়। 'কিন্তু বীণাপানির কাছে সে আসে শান্ত হৃদয়ে... ঝড়ের পর ঢেউ আপনি থামিয়া স্রোতের অন্তর ব্যাপিয়া শুধু একটা নিস্তব্ধ ক্ষিপ্রতা রহিয়াছে।' শেষ পর্যন্ত পিতার বধূহত্যার কৌশল ধরে ফেলে তৃতীয় পত্নীকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। যদিও এই গল্পের মূল

প্রতীত ভূতনাথের দাম্পত্যের ক্ষেত্র নয়, তবুও এ গল্পেই একটি ইতিবাচক দাম্পত্যের চিত্র অঙ্কন করেছেন জগদীশ গুপ্ত।

বৈনাশিক কালের অভিঘাতেই সাহিত্য রচনা করেছিলেন জগদীশ গুপ্ত। আদি-অন্তহীন অমঙ্গল ও দুঃখবোধকে তিনি তাঁর সাহিত্যে স্থায়ী আসন দিয়েছিলেন। সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কগুলির মধ্যেও তিনি দেখিয়েছিলেন জীবনদৃষ্টির অভিনবত্ব। দাম্পত্য সম্পর্ককেও তত্ত্ব ও রোমান্সের মোড়ক থেকে বের করে এনে নিরাসক্ত হয়ে নিরেট রূপদান করেছিলেন। প্রেম-প্রীতিকে অতিক্রম করে জৈব প্রবৃত্তির দাহকেই সেখানে প্রাধান্য দিয়েছেন। হয়ত বা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন কালের পরিপ্রেক্ষিতে। বুঝেছিলেন যে দাম্পত্যে মননের মধু জমা হয় না, কেবল জৈবিক চাহিদার ভিত্তিতে মিলিত হয় দুটি দেহ সেখানে নেমে আসে অবসাদ বিরক্তি— তাই 'মধুমাখা ভ্রান্তি' বলে বিবেচিত হয়। সেখান থেকে হিংসা, রাগ, ক্ষোভ জন্ম নেয়, তৈরি হয় সমাজ বিগর্হিত সম্পর্ক। এই চিত্রই জগদীশ গুপ্ত দেখিয়েছেন তার গল্পজুড়ে। সমাজের কোনো বিশেষ শ্রেণী বা সামাজিক স্তরকে প্রাধান্য দেননি। সমাজের বিভিন্ন স্তর— অর্থনৈতিক, সামাজিক বা শিক্ষাগত যোগ্যতার বিচারে বিচিত্র মানুষের সম্পর্কের স্বরূপ মনস্তত্ত্ব ও প্রবৃত্তি তাড়িত দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান করে গেছেন।

সহায়ক গ্রন্থ

১. অতুল সুর। *ভারতের বিবাহের ইতিহাস।* আনন্দ। কলকাতা। প্রথম পরিবর্ধিত আনন্দ সংস্করণ। ১৩৯৩।

২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। *কালের পুত্তলিকা।* দে'জ। কলকাতা। চতুর্থ সংস্করণ। ২০১০।

৩. নীরদচন্দ্র চৌধুরী। *বাঙালি জীবনে রমণী।* মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা। প্রথম সংস্করণ। ১৩৭৪।

৪. পুলক চন্দ (সম্পা.)। *নারীবিশ্ব।* গাঙচিল। কলকাতা। প্রথম সংস্করণ। ২০০৮।

৫. বিমল কর। *বাছাই গল্প।* মণ্ডল বুক হাউস। কলকাতা। প্রথম সংস্করণ। ১৩৮৭।

৬. ভূদেব চৌধুরী। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা* (চতুর্থ পর্যায়)। দে'জ। কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। ২০০৩

৭. ভূদেব চৌধুরী। *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার।* মডার্ন বুক এজেন্সি। কলকাতা। নতুন সংস্করণ। ২০০৩।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *রবীন্দ্ররচনাবলী* (দশম খণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি। কলকাতা। সার্ধশতজন্মবর্ষ সংস্করণ। ২০১৪।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *রবীন্দ্ররচনাবলী* (একাদশ খণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি। কলকাতা। সার্ধশতবর্ষ সংস্করণ। ২০১৫।